অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

উষ্ণতার ঐশ্বর্য

প্রকাশকরাও কম বড়ো মাপের মানুষ নয়—

শ্রাবণীর এমন বলায় নরেন্দু কিছুক্ষণ পুঁদ হয়ে বসে ছিল। শ্রাবণী মাসে-দুমাসে অন্তত এক-দু-বার তার দোকানে ঢুঁ মারবেই।

বই-এর খোঁজে আসে নতুন পুরোন। আজকাল প্রবন্ধ, সমালোচনা লেখার লেখকই মেলে না। উপন্যাসের কালান্তর বইটি খুঁজতে এসেই প্রথম তার আলাপ নবেন্দুর সঙ্গে।

শ্রাবণী বইটির পৃষ্ঠা উলটে দেখার সময় বলেছিল, আপনাদের এ-রকম আর কী বই আছে?

নবেন্দু তাদের একটি পুস্তক-তালিকা দিয়ে বলেছিল, দেখুন আপনার পছন্দমতো আর কোনও বই পান কি না।

শ্রাবণী প্রবন্ধের তালিকাটি দেখে তাজ্জব। এত বই। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পের উপর সমালোচনার বইটি দেখতে চাইলে বলেছিল, ওটা নেই। আউট অব প্রিন্ট।

আউট অব প্রিন্ট!

আজ্ঞে। ছাপতে গেছে।

তা হলে আবার এলে পাব।

তা বলতে পারি না।

মানে!

মানে ওই একটাই। কালই যদি আসেন পাবেন না। দেরি হবে ছাপতে। কাজেই আবার।

এলেই পাবেন, কথা দিতে পারছি না সেটা কবে কত দিন পরে আসছেন। জানতে পারলে ভালো হয়।

এই সব কথার মধ্যে কিছুটা কৌতুক লুকিয়ে থাকায় শ্রাবণী হেসেছিল।

হাসছেন যে!

শ্রাবণী বলেছিল, আপনার রসবোধ আছে।

সাধারণত কাউন্টার পেরিয়ে ভিতরে ঢোকার অনুমতি থাকে না। শ্রাবণী কাউন্টারে দাঁড়িয়েই তার সঙ্গে যেন কিছুটা মজা ছুড়ে দিয়েছিল।

দেখুন না যদি কোনও স্পয়েলড কপিটপি থাকে।

স্পয়েলড কপি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভিতরে এসে খুঁজে নিন। প্রসন্ন দেশে গেছে—তিনি বলতে পারতেন। থাকলেও আমার পক্ষে খুঁজে বের করা কঠিন। কাল আসুন না।

কাল হবে না।

কেন? কোনও অসুবিধা আছে?

আমি তো পাঁচটার ট্রেন ধরব। ওটাই আমার লাস্ট ট্রেন।

কী ভেবে নবেন্দু বলেছিল, ভিতরে এসে বসুন। সুধীর আসুক। দেখি। পাঁচটা বাজতে অনেক দেরি। কাছেই স্টেশন। ট্রেন ধরতে অসুবিধা হবে না।

নবেন্দু ফের বলল, কোথায় থাকেন?

থাকি তো দূরে, মাঝে মাঝে কলকাতায় এলে কলেজ স্ট্রিটে ঢুঁ মারতে না পারলে পেটের ভাত হজম হয় না।

সুধীর দোকানে ঢুকে দেখেছিল, ছিমছাম লম্বা এবং ভারি সুন্দর একজন যুবতী ভিতরের দিকের চেয়ারে বসে কী একটা বই উলটে পালটে দেখছে।

কোথায় ছিলি এতক্ষণ! একবার বের হলে ফিরতে চাস না।

সুধীর কাঁচুমাচু গলায় বলল, ধীরেনবাবু যে বললেন, বসতে হবে। উপন্যাস সংকলনের কভারের কিছু কাজ বাকি। বসে, করিয়ে নিয়ে এলাম।

উদ্ধার করেছিস। যা চা নিয়ে আয়। আপনি কিছু খাবেন? পাঁচটায় ট্রেন, কখন পৌছবেন? আপনার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসুক।

প্রকাশকরাও কম বড়ো মাপের মানুষ নয় মেয়েটির এমন মন্তব্যে সে কিছুটা সত্যি বিগলিত।

ঘুরে ফিরে একই রকমের ভাঙা। প্র

কাশকরা ঠগ জোচ্চর, বেশি বই ছাপে, গাড়ি-বাড়ি করে, লেখকরা খেতে পায়। প্রাপ্য রয়েলটি ফাঁকি দেবার নানা ধান্দা—কি শ্রাবণীর কাছে প্রকাশকরাও বড়ো মাপের মানুষ রেকর্ডের মতো কানে বাজছিল তার।

প্রকাশকরা অবশ্য সবাই সাধু নয়, শ্রাবণীর জানা উচিত। অসাধু প্রকাশকেরও অভাব নেই। তবে সবাই অসাধু এটাও বলা যায় না। নরেন্দুও এমন ভাবল।

লেখকের দুঃসময়ে প্রকাশকই ভরসা। বিপদে-আপদে ছোটাছুটি যতটা পারা যায়—লেখককে ভারমুক্ত করার ঘটনাও বিরল নয়। কত প্রকাশকের ভালো বই প্রকাশের নেশা হয়ে যায়। পেশার চেয়ে নেশা প্রবল হলে যা হয়, কেউ আবার সর্বস্বান্তও হয়—বই-এর বাজার সব সময়ই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে—বিশেষ করে গল্পউপন্যাসের ক্ষেত্রে বাজার ধরে গেলে পয়সা, সে আর কটা বই!

তার বাবা তো নানা দিক ভেবেই তাঁর দোকান চালু রাখার জন্য গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে স্কুল-বইও করতেন। এতে খুব একটা মার নেই। ঠিকমতো বই ধরাতে পারলে দুটো পয়সাও হয়। তবে ভালো গল্প-উপন্যাসের বই না থাকলে প্রকাশক জাতে ওঠে না, তার বাবা এটা ভালোই বুঝেছিলেন—আর অপরিসীম ধৈর্য লেখককে খুশি রাখা, কাগজ আনা থেকে বাইন্ডার কাকে না খুশি রাখতে হয়! এক-একটা বই ছেপে বের হবার পর সে

দেখেছে, বাবা কী নিশ্চিন্ত। বই-এর প্রোডাকশান-মলাটের ছবি থেকে ব্লক, সর্বত্র তাঁর সতর্ক নজর।

বাবার মাথায় বই ছাড়া কিছু থাকত না।

দোকানে এসে বসতে পারলেই তাঁর মুক্তি। এই ব্যবসাটি বাবা প্রায় পুত্রস্নেহে যেন লালন-পালন করছেন। অসুখে-বিসুখেও বাড়িতে বসে থাকার লোক ছিলেন না তিনি। এই নিয়ে তার মায়ের সঙ্গে তিক্ততাও সৃষ্টি হত।

আরে, এই শরীর নিয়ে তুমি দোকানে যাবে।

কী হয়েছে আমার।

কী হবে আবার! জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, বলছ কী হয়েছে তোমার।

এমন এক-আধটুক সবারই শরীর খারাপ হয়। দোকানে বসলে দশটা লোকের সঙ্গে দেখা হবে, কথা হবে, বই-এর কাস্টমারদের সঙ্গে কথা বলারও আনন্দ আছে জানো। সমস্ত জীবন প্রাণ নিয়ে আট বাই দশ ফুটের ঘরটি যে আমার অস্তিত্ব। দোকানে ঢুকলেই আমার শরীর হালকা, মন হালকা, তুমি ঠিক বুঝবে না।

অগত্যা যাবেই।

নবেন্দু তখন কলেজে পড়ে।

যা তোর বাবার সঙ্গে। এই শরীর নিয়ে একা যাওয়া ঠিক হবে না। আরে না না, আমি একাই যেতে পারব। নবেন্দু তুই আমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিয়ে যা। শ্রাবণীর কথায় মনে হল সত্যি তো, প্রকাশকরাও কম বড়ো মাপের মানুষ না, শ্রাবণী যেন বাবার সম্পর্কে তার চোখ খুলে দিয়েছে।

শ্রাবণী এলে বই নিয়েই বেশি আলোচনা হত। মোহিতলাল মজুমদারের সব বই-ই আছে দেখছি। একসঙ্গে কিনতে পারব না। সারের বইও করেছেন।

সার মানে।

অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

হ্যাঁ আছে, তাঁর কিছু বই আমরা করেছি।

তিনি এখানে আসেন!

এ পাড়ায় এলে ঢুঁ মেরে যান।

আরও সব প্রিয় লেখকও এখানে আসে শুনে, যদি দেখা হয়ে যায় এই আশাতেই শ্রাবণী বইপাড়ায় এলে এই দোকানে ঢুঁ না মেরে যাবে না।

একদিন নবেন্দু না বলে পারেনি, আপনার এত প্রবন্ধের বই কেনার আগ্রহ কেন বলুন তো! সমালোচনার বইও কেনেন দেখছি। কত প্রিয় কবির দেখা হবে ভেবে এখানে ফাঁক পেলেই আসেন। গল্পের বইও তো আমাদের কম নেই, কখনও গল্প-উপন্যাস কিনতে

দেখলাম না। আপনি কী থিসিস নিয়ে ব্যস্ত আছেন। থিসিস যারা করেন, তাদের দু-একজনের সঙ্গে তার আলাপ আছে বলেই এই ধারণা। তারা শুধু প্রবন্ধের বই কেনে।

ওই আর কী। প্রাবণীর অভ্যাস সব বই দেখেটেখে মাত্র একটি দুটি বই কিনবে। ঘরের সংলগ্ন পেছনের ঘরটায় শ্রাবণী আজকাল এলে নিজেই ঢুকে যায়। ঘরটা নিরিবিলি। সুদেববাবু প্রুফের বাণ্ডিল জড়ো করে বসে থাকেন। সে তার পছন্দমতো বই নিয়ে কিছুটা পড়ে—কারণ তার পাঁচটায় ট্রেন বলে ছাত্রীদের বই কেনার পর অথবা নিজের দরকারি বই সংগ্রহ করার পর নবেন্দুর দোকানে এসে বসে। মাঝে মাঝে কথা হয়।

এবং কিছুটা যেন নবেন্দুর উপর সে নির্ভর করতে শিখেছে।

দেখুন তো এই বইটা পেলাম না। যদি পান।

আপনি বসুন, দেখছি।

এ-ভাবে নবেন্দুর সঙ্গে পরিচয়।

ট্রেনে কত দূরে যান?

বহরমপুর।

সেখানে বাড়ি?

তা বাড়িই বলতে পারেন। কলেজে দিদির কোয়ার্টারে থাকি।

বহরমপুর গার্লস কলেজ।

ওই আর কী।

কলেজের মণিদাকে চেনেন?

শ্রাবণী কিছুটা যেন চমকে গেল। মুখেচোখে তার কেমন একটা অপরাধবোধ জেগে যাওয়ায় মাথা নীচু করে ফেলল। নবেন্দু কাজ করে আর কথা বলে।

বই দেখুন ঠিক আছে কিনা। পাঁচ খণ্ড অবিরাম জলস্রোত, তিনটে দুঃখিনী মা, দুটো সোনার মহিমা—এবং রসিদ কেটে টাকা গুনে নেবার সময়ই তার যত কথা।

শ্রাবণীর সঙ্গে কথা বলতে তার ভালোই লাগে।

আপনি কি কলেজে পড়ান?

বাংলা পড়াই।

আজকাল তো স্লেট না নেট কীসব পরীক্ষা দিতে হয়।

শ্রাবণী ঘড়ি দেখছিল।

আরে সময় হয়নি। সুধীরকে পাঠিয়ে দিয়েছি।

এবং শ্রাবণী বোঝে নবেন্দু তার সুবিধা-অসুবিধা খুব বোঝে।

সুধীর শুধু টিকিটই কেটে দেয় না, ট্রেন এলে সিটে বসে থেকে শ্রাবণীদির জন্য প্রায় সিট রিজার্ভ করে রাখে। শ্রাবণীদি দীর্ঘাঙ্গী বলে প্ল্যাটফরমে সহজেই তাকে আবিষ্কার করা

যায়। সে জানালা দিয়ে মুখ গলিয়ে চেঁচাবে, শ্রাবণীদি, এদিকে, এদিকে। এই যে আমি, সে জানালার বাইরে হাত গলিয়ে চেঁচায়।

কথায় কথায় নানা কথা হত। অবশ্য নবেন্দুর আদ্ভুত স্বভাব। সে কখনও তার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না। ওই প্রথম দিনই যা চোখ তুলে বলেছিল, কী বই বললেন? মেয়েদের দিকে তাকালে কি কোনও অপরাধবোধ কাজ করে? কিংবা মেয়েদের সম্পর্কে খুবই লাজুক-শ্রাবণী মনে মনে না হেসে পারে না। সে তো নবেন্দুর নাড়ি-নক্ষত্রের সব খবরই রাখে।

হাটেবাজারে।

এটা আমাদের বই নয়।

চিরকুট দিলেও নবেন্দু তাকাত।

ও আপনি!

সে কাউন্টারের কাঠ তুলে তাকে ঢুকতে বলত।

ওই একবারই, তারপর সে কখনও দেখে না, নবেন্দু তার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে। কাজের ভিড়ে বেশি কথাও হয় না।

নবেন্দু কি মেয়েদের পছন্দ করে না! স্ত্রী মণিকা তাকে ছেড়ে যাওয়ায় কি সে

মেয়েদের ঘৃণা করে!

নবেন্দু খুবই চাপা স্বভাবের মানুষ। খুব বেশি দিলখোলা নয়। সেটুকু কাজ তার বাইরে কোনও কথাই হত না। তবু দেখেছে, দেয়ালের ফটোটি খুঁটিয়ে দেখলে নবেন্দু বোধহয় খুশি হত। একজন প্রৌঢ় মতো মানুষ, কেমন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত চোখমুখ–

আপনার বাবা।

আজ্ঞে।

পরিচয়ের প্রথম দিকে এসব কথা হত।

আপনার বাবা খুব রাশভারি মানুষ ছিলেন!

মোটেও না। দিলখোলা মানুষ সব সময়।

মানুষজন নিয়ে থাকতে ভালোবাসতেন। বিপদে আপদে তিনি সবার বেলাতেই আপ্রাণ চেষ্টা করতেন, কোথায় কার কাছে গেলে কাজ উদ্ধার করা যাবে দরকারে হাসপাতাল পর্যন্ত ভর্তি করে দিতেন।

তার পরই থেমে বলত, বাবার মাথায় অবশ্য বই ছাড়া কিছু থাকত না। দোকানেও বই, বাড়িতেও থলে ভর্তি প্রুফ। এক দণ্ড বসে থাকতেন না।

শ্রাবণী বোঝে নবেন্দু তার বাবা মানুষটির জীবন সম্পর্কে ভারি অহংকারী।

সে দেখেছে, বাবার কথা উঠলেই নবেন্দু তার নিজের কাজের কথাও ভুলে যেত। এত বড় প্রকাশনের মালিক, অথচ এক সময় তার বাবাকে বই ফিরি করতে হত—সেই

ফেরিওয়ালা এই বইপাড়ায় জাতে উঠতে কত না পরিশ্রম করেছেন। আসলে অপরিসীম ধৈর্য-প্রুফরিডারদের হাতেই তিনি সব ছেড়ে দিতেন না। প্রিন্ট অর্ডারের আগে নিজে খুঁটিয়ে পড়তেন—কোথায় না আবার ছাড় যায়। বানান নিয়েও ঝামেলা কম না—এক-একজন লেখক এক-এক রকম বানান পছন্দ করেন। সে তার বাবার উদয়াস্ত পরিশ্রম দেখে ভেবেছিল, আর যেই আসুক সে অন্তত বই-এর লাইনে আসছে না। কলেজে কাজটাজ নিয়ে, অথবা অন্য কোনও ব্যবসায় নেমে যাবে।

হল কই।

বাবা বলতেন পরের গোলামি নাই করলে। বই-এর ব্যবসায় সৃষ্টির আনন্দ আছে।

নবেন্দু দোকানে বসত, তবে কোনও আকর্ষণ বোধ করত না। কী আছে। দিনরাত তাগাদা। এখানে যাও, ওর সঙ্গে কথা বলো। অমুক লেখক রাজি হয়েছেন বই দেবেন। যাও তার কাছে। সে তখন এক ধরনের হীনম্মন্যতায় ভুগত। সবার কাছে জো-হুজুর হয়ে থাকা কাঁহাতক ভালো লাগে। লেখকরা কেউ কেউ এমনও বলত, হবে না। তোমরা বই ভালো চালাতে পারো না। ঠিকঠাক হিসাব পাচ্ছি কোথায়।

সে এসে ক্ষোভে দুঃখে বলত, আমাকে আর পাঠাবেন না। আপনি ইচ্ছে হয় যান। ঠিকঠাক হিসাব দিয়ে আসুন গে।

বাবা বালকের মতো হেসে ফেলতেন।–আরে কান ভাঙানোর লোকের তো অভাব নেই। তাঁরা বলতেই পারেন। উপন্যাস গল্প লেখা কি চাট্টিখানি কথা। তুই পারবি, না আমি

পারব। প্রতিভা না থাকলে হয় না। এরা হলেন দেবী সরস্বতীর বরপুত্র। ওদের গালাগাল খেলেও পুণ্য হয়, বোঝে।

শ্রাবণী এই আসা যাওয়ায় কত কিছু যে জেনেছে। যত জেনেছে তত দিব্যেন্দু এবং তার পরিবারের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছে। আজকাল মাঝে মাঝে কাজ না থাকলেও এই বইপাড়ায় চলে আসে। কোনও পারিবারিক উৎসবে অনুষ্ঠানে কাছাকাছি, এই যেমন বেলেঘাটা কিংবা সোদপুর, কখনও টিটাগড় এলে কোনও কোনও অজুহাতে নবেন্দুর দোকানে ঢুকে যেত। কলেজ লাইব্রেরির জন্য বাজারে ভালো বই বের হলে সংগ্রহ করত। কখনও বই কেনে, আবার কেনেও —দরকারে চিঠি লিখলেই নবেন্দু কারও হাতে বই পাঠিয়ে দেয়। বই কিনতে যারা দোকানে আসে তাদের বলে দিলেই হল, এই অজিত শোনো। তারপর অজিতকে বই-এর প্যাকেটটি এগিয়ে দিলেই হল, অজিত বুঝে নেয়, লালদিঘির পারে মেয়েদের কলেজের শ্রাবণীদির প্যাকেট। শ্রাবণীদিও আদ্ভুত, কী করে যে জানাজানি হয়ে গেছে, তাকে দিলেই কমিশনে বই আনিয়ে দিতে পারে। স্কুল বইয়ের বেলায় সে মাঝে মাঝে নবেন্দর হয়ে নানা স্কুলে চিঠিও লিখে দেয়, আট দশ বছর হয়ে গেল সে কলেজে পড়াচ্ছে, তার ছাত্রীরা শহরের স্কুলে কিংবা গাঁয়ের স্কুলে অনেকেই শিক্ষয়িত্রীর কাজ পেয়ে গেছে, নবেন্দুর লোক তার কাছে গেলেই বোঝে সিজনের সময়, নিশ্চয় নবেন্দুর হয়ে চিঠি লিখে দিতে হবে—স্কুলে বইটি যদি পাঠ্য করা যায়।

তা ছাড়া নবেন্দুর কিছু গল্প-উপন্যাস হটকেক–নবেন্দু বলে এগুলি আমার সোনার খনি। বাবার দূরদৃষ্টিতে সব হয়েছে।

আমাদের দুটো উপন্যাসের যে চাহিদা হয়েছে, এবং নানা পত্রপত্রিকায় বই দুটোর সম্পর্কে লেখালেখি বলুন, লেখকের পুরস্কৃত হওয়া—সবই মণিদার কল্যাণে। মণিদা বাবার হিতৈষী। অথচ মানুষটা কোথায় যে হারিয়ে গেল। মণিদার কথা উঠলেই শ্রাবণী কেমন অতল জলে ডুবে যায়। কতকাল পর একজন পুরুষমানুষকে তার ভালো লাগছে—সেই মানুষটা যদি জেনে যায় সব। যদি সে ধরা পড়ে যায়।

তবু আজ অনেক সাহস সঞ্চয় করে শ্রাবণী বলল, উনি তো শহরে থাকেন না। পার্টির কাজে গাঁয়েগঞ্জেও ঘুরে বেড়ান শুনেছি। তিনি কি এখানে আসেন?

আদ্ভুত মানুষ, আমরা আশা করতাম তিনি আসবেন— কি আর আসেননি। শুধু একবার বাবাকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন, পাণ্ডুলিপি তিনি পাঠিয়ে দেবেন। লেখক নিজেই যাবেন।

এবং লেখক পাণ্ডুলিপি জমা দিয়ে গেলে বলতে গেলে চোখ বুজেই বাবা প্রেসে দিয়েছিলেন ছাপাতে। বাবা পরে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি চিঠি দিয়েছিলেন জানি, তবে তার উত্তর পাওয়ায় আগেই—

উত্তর আর আসেনি?

না।

আপনি মণিদাকে চেনেন?

শ্রাবণী চা খাচ্ছিল। কোনও জবাব দিল না।

হঠাৎ নবেন্দু কেন যে বলল, এবারের বুক সিজনে ভাবছি ও দিকটা আমি নিজেই একবার ঘুরে আসব। পুরনো এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে হয় না–কিছু পারিবারিক বিপর্যয়ে প্রকাশনার কাজ থিতিয়ে এসেছিল। এখন আপনাদের সবার সহযোগিতায় মনে হয়েছে, এই প্রতিষ্ঠানটিকে ঠিক চালিয়ে যাওয়াই আমার বড়ো কাজ।

মন বসেছে।

বসে তো উপায় নেই। বাবা আমার জন্য ভেবে ভেবেই মরে গেলেন।

কী বলছেন।

ঠিকই বলছি।

তার পরই নবেন্দু কেমন সতর্ক হয়ে গেল। পারিবারিক বিপর্যয় কথাটা বলা ঠিক হয়নি। শ্রাবণী এলে তারও ভালো লাগে। বাড়িতে মা এবং মাসি মামারা বারবার বলেছে, একবার বাড়িতে আসতে বল না। আত্মীয়তা তৈরি করতে হয়। মানুষের সম্পর্ক কী হয়ে একমাত্র মানুষই ঠিক করতে পারে। একজনকে দিয়ে সবাইকে বিচার করিস না।

অতটা দুঃসাহস তার নেই নবেন্দু ভালোই জানে। বরং শ্রাবণীর আর কে কে আছে, আজকাল মেয়েদের বোঝা মুশকিল, বিবাহিত বা কুমারী। কারণ অনেক আধুনিকাই শাখা-সিঁদুর নারী স্বাধীনতার নামে বিসর্জন দিয়েছেন।

শ্রাবণী না এলে নবেন্দু টেরই পেত না, একজন প্রকাশকও লেখকের প্রতিটি হরফের প্রতি সতর্ক নজর রাখে। লেখকরা লেখক হয় প্রকাশকের পরিশ্রমের গুণে। শ্রাবণী কী

টের পেয়েছিল এই থরে থরে সাজানো বই-এর ঘ্রাণ তার বাবা না থাকলে সে বুঝতে পারত না। কতটা গভীর মনঃসংযোগ থাকলে, এটা হয়, টের পেয়েই হয়তো তার বাবাকে এত বড়ো কথা—প্রকাশকেরাও কম বড়ো মাপের মানুষ ভাবেন কী করে। প্রকাশনার কাজ যথেষ্ট গৌরবের। বাবার বই-এর দোকান নিয়ে এতটা অবহেলা দেখানো আপনার উচিত হয়নি। আর কণিকা বইয়ের মর্মই বুঝল না। এটা কোনও ব্যবসা!

আসলে সেই থেকেই কি নবেন্দুর এত টান জন্মে গেল প্রকাশনার প্রতি। শ্রাবণী এলে যেন বুঝতে পারে, তার বাবার মতোই সে এই প্রকাশনের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ খাটছে।

সেই থেকেই তার কি শ্রাবণীর প্রতিও টান জন্মে গেল।

সে তো নিজে গিয়ে বইতে শ্রাবণীর প্রিয় লেখকদের অটোগ্রাফ নিয়েছে।

সপ্তাহ শেষ হতে না হতেই চিঠিও দিয়েছিল।

শ্রাবণী আপনার অনুরোধ রক্ষা করা গেছে। সুযোগসুবিধা মতো বইগুলি নিয়ে যাবেন। রেফারেন্স সংক্রান্ত বই দুটো বাজারে পাওয়া যায়নি। তবে কিছুদিনের মধ্যেই আশা করি বই দুটো সংগ্রহ করতে পারব। আশা করি একা একা দিনগুলি বই আর ফুল নিয়ে বেশ কেটে যাবে। আপনি যে বলেছিলেন বই আর ফুলের মতো এত পবিত্র আর কিছু হয় না।

তার পর লিখে ভাবল, না এসব লেখা ঠিক না। সম্পর্কের জোর চাই। এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি যে সে সম্পর্কের জোরের ওপর কোনও দাবি করতে পারে।

কোনো সম্পর্কই ছিল না।

এতদিন পরও কোনও সম্পর্ক তৈরি হয়েছে বলে সে তেমন কিছু ভাবতে পারত না। কি চিঠি লিখতে গিয়ে বুঝল, সম্পর্কের জোর না থাকলে এত বড়ো কথা অনায়াসে চিঠিতে লিখতে পারত না। জীবনের অন্তরালে কখন যে কীভাবে নতুন জীবন তৈরি হয় সে জানেই না।

সে যাই হোক নবেন্দু শেষ পর্যন্ত শেষ লাইন দুটো কেটে দিল। তার দুর্বলতা ধরা পড়ে গেলে সে খাটো হয়ে যাবে।

তারপর মনে হয়েছিল, কাটাকুটিও সংশয়ের উদ্রেক করতে পারে। নবেন্দু কী লিখল—আবার কেটে দিল—কেন কেটে দিল-কৌতূহল হতে পারে এবং লেখা উদ্ধারের প্রাণান্তকর চেষ্টায় এক সময় যদি ভেবে ফেলে—লোকটা সুবিধের নয়। বাজে লোক।

ফের নতুন করে চিঠিটা লিখেছিল।

সাদামাঠা চিঠি। কোনও কাটাকুটি নেই।

তারপরই মনে হয়েছিল সে তো খারাপ কিছু লেখেনি।

বোকার মতো কাটতে গেল কেন!

একা একা দিনগুলি বই আর ফুল নিয়ে বেশ কেটে যাবে। কবিতার মতো শুনতে। ভালোবাসলে কবিতা আসে। তবে চিঠিতে একজন পরিচিত নারীকে কবিত্ব প্রকাশ করলে সে অন্য রকম ভাবতেই পারে।

শেষে ভেবেছিল, সম্পর্কের জোর না থাকলে দোষের হতে কতক্ষণ!

ঠোঁটে বিদ্রুপের হাসিও ফুটে উঠতে পারে।

চিঠিতে আবার কবিত্ব ফলানো হয়েছে। না, কেটে দিয়ে সে ঠিকই করেছে। তাকে কেউ উজবুক ভেবে মনে মনে মজা পাক সে তা চায় না।

শ্রাবণী চিঠির উত্তরে লিখেছিল, অনেক ধন্যবাদ। কষ্ট করে লেখকদের অটোগ্রাফ সংগ্রহ করার জন্যও ধন্যবাদ। আপনার চিঠি পেয়ে খুব ভালো লাগল। তবে নিজে যেতে পারছি না। অফিসের সন্ধ্যাদি যাবে। ছুটিতে দেশে গেলে আপনার সঙ্গে দেখা করবে। আগরপাড়ার দিকে থাকে। তাকে একটা হাতচিঠি দিয়ে দেব। বিশ্বাসী এবং নির্ভরযোগ্য।

চিঠি পেয়ে নবেন্দু খুব হতাশ হয়ে পড়েছিল। চিঠিতে যেন বিন্দুমাত্র আকুলতার ছাপ নেই।

চিঠি পেলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসবে এমন মনে হয়েছিল। লেখকদের সম্পর্কে শ্রাবণীর দুর্বলতা যে যথেষ্ট, তাদের অটোগ্রাফ পেলে সে যে বর্তে যায়, অথচ বইগুলি সম্পর্কে তার এখন যেন বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। ছুটিতে সন্ধ্যাদি যাবে, তার হাতে দিলেও হবে। কিছুটা অপমানজনকও মনে হল।

শ্রাবণী চিঠি পেলেই চলে আসবে এমন ভেবে নিজের ড্রয়ারে যত্ন করে বই কটা রেখে দিয়েছিল। মেলা বই-এর মধ্যে হারিয়ে গেলে খুঁজে পাওয়া কঠিন।

তারপর মনে হল কাউন্টারে কিংবা ড্রয়ারে যেখানেই প্যাকেট থাকুক গোলমাল হবার কথা না, তার লোকজন এতটা কেউ নির্বোধ নয়। শ্রাবণীর বেলায় এতটা ত্রাস কেন মনে চেপে বসেছিল এতক্ষণে যেন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

ত্রাস ছিল শ্রাবণীর এই দুর্মূল্য বইগুলি না আবার হারিয়ে যায়।

শ্রাবণী না আবার রাস্তা হারায়।

শ্রাবণী না আবার তাকে ভুল বোঝে। তার এত বেশি আগ্রহ শ্রাবণীর কাছে বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে।

সে যে কী করে।

বাজার খারাপ, কাউন্টারে ভিড় কম।

সে সুধীরকে ডেকে বলল, এই অসীমবাবুকে ও-ঘর থেকে ডেকে আন।

অসীমবাবুকে ও-ঘর থেকে ডেকে আন।

অসীমবাবু এলে নবেন্দু বলল, আমি কাল পরশু আসছি না।

কেন! শরীর খারাপ?

শরীর ঠিকই আছে।

তবে!

আমার আর কিছু ভালো লাগছে না। বলতে পারত–কি তার পক্ষে একজন কর্মচারীর কাছে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করা ঠিক না। শ্রাবণী মাঝে মাঝে এসে তার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে, শ্রাবণী যদি তার জীবনের বিপর্যয়ের কথা জেনে ফেলে তবে তাকে অ্যাভয়েড করতেই পারে। কেমন সরল সুন্দর এক যুবতীর আকর্ষণে সে বোধহয় ফের আবার এক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে গেল।

তুচ্ছ কারণে শ্রাবণী তার—বই-এর দোকানে ঢুকে নানা আবদার করত।

সে চেষ্টা করেছে সব আবদার রক্ষা করার—শ্রাবণীকে দেখে কেমন এক মর্যাদাবোধে দিন দিন আক্রান্ত হয়ে পড়ছিল—

চাপা স্বভাবের বলেই মুখ ফুটে কিছুই প্রকাশ করতে পারত না। সে নিজে সঙ্গে যেত, স্টেশনে দাঁড়িয়ে গল্পও করেছে। কোনও রেস্তোরায় দুজনে সামনাসামনি বসে অকারণে কত কথা বলেছে, শ্রাবণীর স্বভাব জোরে হাসার, আবার দেখেছে, কথা বলার সময় তাকে সামান্য ঠেলে দিয়ে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েছে।

একদিন না বলে পারেনি, শ্রাবণী, তোমার ফোন নেই?

শ্রাবণী মুচকি হেসেছে।

কারণ শ্রাবণী জানে, এইটুকুই যথেষ্ট, কোয়ার্টারে ফোন আছে, কখনও সে ফোনে কথা বলেনি—ফোনে কথা বললেই যেন শ্রাবণী ধরা পড়ে যাবে।

কারণ শ্রাবণী জানে পুরুষমানুষের আপাত এই মিষ্টি ব্যবহার বিয়ের পর কত রুক্ষ হতে পারে এবং এক অপ্রিয় কর্কশ জীবন তৈরি হয়ে যায়, তারপর পুরুষমানুষের নানা বিকৃত যৌনতারও সাক্ষী সে। মণিকে সে চিনতে পারেনি। মণিদা তাদের পরিবারের বন্ধু, মকরিও সে মণিদার অনুগ্রহে পেয়েছে—এবং সেই মানুষটিই ক্রমে এক দৈত্য হয়ে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে উড়িয়ে দিয়ে উপগত হয়েছে।

আমার লাগছে।

আমি পারছি না। ছাড়ো।

তখনই সংশয় এবং মণি জোরজারই শুধু করেনি, বিকৃত কামনায় তার সর্বস্ব লুণ্ঠন করতেও চেয়েছে। ফোনের নম্বর সে দেয়নি। কারও ফোন এলে কিছুটা দৌড়ে গিয়ে ফোন ধরবেই। ইচ্ছে করেই গোপন করে গেছে। কারণ কোয়ার্টারে মা-বাৰা-দিদি আর প্রাণের চেয়ে অধিক এক অস্তিত্ব নিরন্তর তার এক উৎকণ্ঠার বিষয় ছিল।

মণিদাকে নবেন্দু চেনে, তার কাছে যদি সব খবর পেয়ে যায়—আরে কী করছ, আবার ভুল করবে। এত ঠান্ডা বরফ যে তাকে উষ্ণ করে তোলাই কঠিন।

বিয়ের মাধুর্য রক্ষা করতেও যৌনতার শিল্পবোধ না থাকলে হয় না, মণি তা বুঝতই না।

যাই হোক সে আর নবেন্দুর কাছে যেতে চায় না। আসলে সে যে ভালোবাসার কাঙাল। তার শরীরকে ব্যবহার করবে, অথচ, ভালোবাসবে না! এ তো ফুল ফোঁটার মতো, মনোরম কুয়াশায় ফুল তার পাপড়ি মেলে, সেই কুয়াশায় রহস্যটি যে পুরুষ বুঝতে চায় না, শুধু স্ত্রীর অধিকারে শরীর ব্যবহার করতে চায়, তার প্রতি যে ঘৃণা জন্মায়-নিপীড়িত মনে হয় নিজেকে, একটাই জীবন, তখন মনে হয় এই রাহুগ্রাস থেকে আত্মরক্ষা না করতে পারলে তার জীবন অর্থহীন। মণি কাছে এলেই সে তার মুখে দুর্গন্ধ পেত।

এত সব চিন্তায় ক্লিষ্ট হয়ে সন্ধ্যাকে একটি চিঠি লিখেছিল। সে জানে নবেন্দু এতে অপমানিত বোধ করবে। কারণ সে তো জানে, প্রতিদিনই কোনও না অতর্কিত মুহূর্তে কোনও সুন্দর মুখ দেখার প্রত্যাশায় নবেন্দু বসে থাকে। সে যদি না যায় তখন ব্যাজার মুখ। এই যে নবেন্দুর মহাবিশ্ব তার কাছে এক অশরীরী চৈতন্য হয়ে বিরাজ করছে, মুহূর্তে দেখামাত্র সব ম্লান অন্ধকার দূর হয়ে যায়। সে যায়, মাসে ছ-মাসে যায়, তবে নবেন্দুর কাছে এই যাওয়া আবির্ভাবের সামিল।

সেও তো কম ছলনার আশ্রয় নেয়নি।

সে তো বলতেই পারত, আপনার সব খবরই আমি রাখি। আপনার মণিদা আমাকে সব বলেছে, কথায় কথায় এত প্রশংসা করলে কার না রাগ হয় বলুন তো। বারবার এক প্রশ্নে আহত। এতই যদি গুণবান—তবে জীবনে তার এত বড়ো বিপর্যয় নেমে আসে কেন!

আসলে ওর বাবা মহেশবাবুরই ভুল, গুরুদেব বলেছেন এক কথায় রাজযোটক। মেয়েটি যে মানসিক অসুস্থতার শিকার বিয়ের পর মহেশবাবু হাড়ে হাড়ে টের পেলেন, তারপর যা হয়, শত হলেও গুরু বাক্য—সুতরাং বছর দুই চেষ্টা করেছেন পুত্রের দাম্পত্যজীবন রক্ষা পাক। কথায় কথায় ভয় দেখাত, গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করবে।

চিকিৎসা করাতে পারত।

কণিকার বাবা রাজি না। কণিকা মানে নবেন্দুর স্ত্রী—তার বাবা বধূ-নির্যাতনের অভিযোগ তুললেন, আদালতে গেলেন। স্বেচ্ছায় ডির্ভোস নেওয়ালেন, তারপর পূর্ব প্রণয়ীর সঙ্গে বিয়ে দিতেও বাধ্য হলেন।

মহেশবাবু খোঁজখবর নিলেন না পাত্রীর?

ওই তো গুরুবাক্য। গুরুর আশীর্বাদে তার এত জয়ময়, তাঁর পক্ষে সম্ভব গুরুবাক্য লঙঘন করা!

ইস এভাবে একটা জীবন নষ্ট হয়ে গেল।

মহেশবাবু সেই যে বিছানা নিলেন—

থাক আর বলতে হবে না।

সেই মণিদা, অর্থাৎ মণিমোহনেরই বা কী পরিণতি। নবেন্দুর কষ্টের কথা ভাবলেই তার শরীরে জ্বর আসত। শরীর গরম হয়ে উঠত। আর মণিমোহন কাছে এলে শীতল হয়ে যেত শরীর। নবেন্দু সুন্দর, সুপুরুষ, দীর্ঘকায়, পাত্র হিসেবে দুর্লভ। অথচ দ্যাখো কী

দুর্ভাগ্য এক পুত্রবধূর পাল্লায় পড়ে গোটা সংসারটা তছনছ হয়ে গেল মহেশবাবুর। নারী হল গিয়ে পুরুষের মুক্তি।

সেই মুক্তির স্বাদ মণিমোহনের কাছ থেকে এভাবে সম্ভোগ করবে শ্রাবণী জীবনেও চিন্তা করেনি। আসলে এক অন্তর্গত খেলা, একজন অদৃশ্য যুবক অদৃশ্য বলে বলা যায় সেই কবে মণিমোহন কোনও বইমেলা কিংবা জেলার বইমেলায় তাকে নিয়ে গেলে বলত চলো আলাপ করবে। সে যায়নি। ভিড়ের মধ্যে নবেন্দুকে দেখেছে— সত্যি বেচারা। মুখ দেখলেই ওর ভিতরের কষ্ট সহজেই বোঝা যেত। যৌনতার স্বাদ পাওয়া একজন পুরুষের পক্ষে নারী বিহনে থাকা যে কত কঠিন দূরাগত কোনও মিউজিকের মতো সেই কষ্টের মুখ তাকে সর্বদা অনুসরণ করত। পাগল পাগল লাগত।

এ ভাবেই সে কলকাতায় এলে একবার সেই দোকানটি আবিষ্কার করে ফেলেছিল। দোকানের মালিককেও-সুপুরুষটিকেও।

সে ছলনার আশ্রয় নিল।

উপায় ছিল না, মণিমোহন তার জীবন থেকে কিছুতেই নিশ্চিহ্ন হবে না। কারণ মণিমোহন তার পুত্রের দাবি করেনি, একটি শিশুঁকে বড়ো করতে গেলে সুবিধা অসুবিধা অনেক। সে কিছুটা বাউণ্ডুলে স্বভাবের। আর শ্রাবণীরও ইচ্ছা নয়, সে একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাক। শিশুটি তার যে প্রাণের চেয়ে অধিক। সে শুধু ডিভোর্সি নয়, সে জননীও। জননী হলে যে সমাজে ব্রাত্য হতে হয়। অথচ শরীর মানে না। তার পাগল পাগল

লাগত। এবং নবেন্দুকে সে নানা ভাবেই ছলনা করেছে। কী নবেন্দু ভালোবাসার জন্য পাগল। তার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত, তারও নবেন্দুকে নিয়ে কম স্বপ্ন তৈরি হয়নি।

এইসব দোলাচলে সে যখন কাহিল, তখনই পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে স্থির সিদ্ধান্ত নেয়, নবেন্দু যদি ছুটে আসে তার কাছে, এবং এত দিন যে ছলনার আশ্রয় নিয়েছে, তা নিমেষে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে। সে শ্রাবণীর প্রকৃত সচিত্র পরিচয়টি তুলে ধরতে চায়।

আমি শ্রাবণী।

আমার প্রাক্তন স্বামী মণিমোহন দাস।

আমি জননী। এই আমার খোকা, তাকে এবারে নার্সারিতে ভর্তি করাতে হবে। ছেলের প্রিপারেশানে ব্যস্ত আছি। ভালো স্কুলে ভর্তি করানো যায় কি না দেখছি। ফর্ম পূরণে তার বাবার নাম না দিয়ে উপায় নেই। এসব কারণে যাওয়া হচ্ছে না। সন্ধ্যাদিকে পাঠাচ্ছি। কত কিছু চিন্তা করে যে সন্ধ্যাদিকে পাঠাচ্ছে—মানুষটাকে অন্ধকারে রেখে এই লুকোচুরি তার আর সহ্য হচ্ছে না।

সন্ধ্যাদি রাতে হাজির। সকালের ট্রেন ধরবে। সন্ধ্যাদিকে তার ছাপানো কার্ডটি দিয়ে বলল, এটি দেবে বাবুকে। আর কিছু বলতে হবে না। তিনি বই-এর একটি প্যাকেট দেবেন। ওটা নিয়ে সোজা আবার ট্রেন ধরবে। কোনও প্রশ্ন করলে বলবে, আমার শরীর ভালো না। ফোনে যোগাযোগ করতে বলবে।

তুমি তো শ্রাবণীদি ফোনেই বলে দিতে পারো।

কী বলব?

তোমার শরীর ভালো না।

তিনি জানেনই না আমার বাড়িতে ফোন আছে। কার্ডটা কি যত্ন করে নেবে।

আসলে এত বেশি হ য ব র ল হয়ে যাবে জীবন, শ্রাবণী ভাবতেই পারেনি। যতই দুজনের মধ্যে টান তৈরি হোক, যতই নবেন্দুর কথা ভাবলে পাগল পাগল লাগুক, এত সব ছলনা শ্রাবণী এখন নিজেই সহ্য করতে পারছে না। কেন যে মরতে দোকানে ঢুঁ মেরেছিল।

শ্রাবণী তুমি এলে না। সন্ধ্যাদিকে পাঠালে। কত আশা করেছিলাম তুমি আসবে। মাকে তোমার কথা বলেছি।

এত দিনে! কী বললেন।

খুব খুশি। মা দিদি সত্যি খুব খুশি। কবে আসবে?

দেখি।

একটি কথা বলব শ্রাবণী। তোমার কার্ড দেখে বুঝতে পারলাম, ফোনে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। অথচ ফোন সম্পর্কে তুমি নীরব থাকতে। ফোন নম্বর চাইলে অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতে। কেন? আমাদের দুজনেরই যথেষ্ট বয়েস হয়েছে।

শ্রাবণী চুপ করে আছে।

কী হল, কথা বলছ না।

ভাবছি। জানো তো সব স্বামী-স্ত্রীই চায় বিয়ের পর স্বপ্নের রেলগাড়িতে উঠে যেতে। এক সময় স্বপ্নটাই থাকে। রেলগাড়ি থাকে না, কখন যে এক তুষার-ঝড় এসে সব লণ্ডভণ্ড করে দেয়। তাই আমার স্বপ্নের রেলগাড়িতে উঠতে ভয় লাগছে। আমারই দোষ, তোমার মণিদাকে ভালোবাসতে পারিনি। কাছে এলেই শরীর শীতল হয়ে যেত। তবু মানুষটি শরীরে দাগ রেখে গেছে। জননদাগ—চিতায় না উঠলে দাগ মিলবে না। ইমনের স্বভাব দৌড়ে গিয়ে ফোন ধরা-কে আপনি? মা, দাদুমণির ফোন। মা বড়ো মাসির ফোন। আপনি ফোনে কথা বললে ধরা পড়ে যেতাম। আমি ডিভোর্সি, নবেন্দুবাবু।

আমি সব জানি শ্রাবণী। তুমি আসছ না শুনে কেমন ঘাবড়ে গেলাম। পাগলের মতো কিছু করে ফেললাম, আমাদের গোরাবাজারের এজেন্টকে তোমার খবর নিতে বললাম। সাত-আট বছর ধরে একা। ন্যাড়া বেলতলায় যেতে আর রাজি না

বলে মা-র সঙ্গে কথা বন্ধ। সংসার ঘরবাড়ি সব অর্থহীন। অন্ধকার। মাকে সব কথা বলেছি। রাজি। বাড়িটায় আবার আলো জ্বলবে।

নবেন্দুবাবু, আমি একটা খারাপ মেয়ে—

কী বাজে বকছ বলো তো? তোমার স্বপ্নের রেলগাড়িতে আগে উঠে বসি, কত দূর যাওয়া যায় দেখি। যেতে যেতে ঠিক হবে খারাপ না ভালো। ভালো না লাগলে সামনের কোনও

স্টেশনে নেমে গেলেই হবে। আমি নিজেও কম খারাপ না। কণিকা আমাদের গোটা পরিবারের মাশয় কলঙ্ক চাপিয়ে চলে গেছে। আজ রাতের ট্রেনেই তোমার কাছে যাচ্ছি।

এবং জ্যোৎস্নায় রেলগাড়িই ছুটছে। নবেন্দু জানালায় বসে আছে। আকাশ নক্ষত্র এবং শস্যক্ষেত্র পার হয়ে গাড়িটা ছুটছে।